# কওমী মাদরাসার ইতিহাস ঐতিহ্য ও অবদান

বিশ্বের শীর্ষ ইসলামী বিদ্যাপীঠ দারুল উলূম দেওবন্দের সম্মানিত মুহতামিম
হযরত মাওলানা আবুল কাসেম নুমানি সাহেব দা. বা.এর ঐতিহাসিক বয়ান
(স্থান: ফ্রেন্ডস্ ক্লাব মাঠ, সেক্টর-৩, উত্তরা, ঢাকা। তারিখ: ৯ই ফেব্রুয়ারী, শনিবার, ২০১৩ ঈ.)

**ভাষান্তর: শাইখুল হাদীস মুফতী মনসূরুল হক দা. বা.**

قال الله تبارك و تعالى اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا.

সম্মানিত উলামায়ে কেরাম,বুযুর্গানে দ্বীন, যুবক বন্ধুগণ, ও প্রিয় অনুজ!
আজকের এই জৌলুসপূর্ণ মাহফিল শহর অঞ্চলে অনুষ্ঠিত হচ্ছে, এখানে অংশগ্রহণকারীগণের মধ্যে রয়েছেন নিজ নিজ অঞ্চলের উচ্চ পর্যায়ের উলামায়ে কেরাম, বড় বড় দ্বীনী প্রতিষ্ঠানের মুহতামিমগণ, শাইখুল হাদীস, শিক্ষকবৃন্দ,শহরের সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিবর্গ ও প্রিয় শিক্ষার্থীদের বড় একটি অংশ, এ দিকে লক্ষ্য করে এটি একটি মহিমান্বিত মাহফিল।

সময় স্বল্পতার কারণে সংক্ষিপ্ত ও সারগর্ভ কিছু আলোচনা করবো, যা আমরা আমাদের আমলী জীবনে পাথেয়রূপে গ্রহণ করতে পারি এবং তার আলোকে আলোকিত হতে পারি।

আমার প্রিয় বন্ধুগণ!
ঘোষণার মধ্যে আমার ব্যাপারে বারংবার একটি নিসবত ও সম্পর্কের কথা বলা হচ্ছিল, আর তা হচ্ছে 'দারুল উলুম দেওবন্দ' এর নিসবত, যা আমাদের আকাবিরের আমানত, যার খেদমতের সাথে সম্পৃক্ত হওয়ার তাওফীক আমার হয়েছে। এই নিসবতকে কেন্দ্র করেই আমাদের প্রতি গণমানুষের ভক্তি-শ্রদ্ধা ও মুহব্বাত, তার কারণ হলোঃ আল্লাহ তা'আলা আমাদের আকাবিরকে আক্বীদা, ইলম, আমল, পরহেযগারী, খোদাভীতি, দ্বীনদারী, বীরত্ব, আমানতদারী, প্রভৃতি যাবতীয় বৈশিষ্ট্যে এমনভাবে বৈশিষ্ট্যময় করেছিলেন যে, সেগুলোর যে কোন একটি নিয়ে চিন্তা করলে এবং তাদের জীবনের যে কোন অধ্যায়ের প্রতি লক্ষ্য করলে দেহে নতুন প্রাণের সঞ্চার হয়, জীবনের নতুন দিগন্ত উন্মোচিত হয়।

দেওবন্দ পৃথক কোনো দল বা গোষ্ঠীর নাম নয়, বরং রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ২৩ বৎসরের জীবদ্দশায় সাহাবায়ে কেরাম রাযি.কে যে শিক্ষার ধারক বাহক বানিয়ে ছিলেন, আক্বীদার সংশোধন করেছিলেন, সৎচরিত্রের মূর্তপ্রতিক বানিয়েছিলেন, ন্যায়-নিষ্ঠা, তাক্বওয়া, আমানতদারী, দ্বীনদারী, খোদাভীতি, সুন্নাতের অনুকরণ, খোদাপ্রেম, রাসূলপ্রেম, আল্লাহর রাহে সর্বস্ব বিলীন করে দেওয়ার অদম্য উদ্দীপনা, একনিষ্ঠ একত্ববাদ, দ্বীনের ক্ষেত্রে অটলতা ও দৃঢ়তা, বাতিল আক্বীদা-বিশ্বাস ও বাতিল সম্প্রদায়ের বিরুদ্ধে আপোষহীন মনোভাব প্রভৃতি সমুদয় বৈশিষ্ট্যাবলী যা সাহাবায়ে কেরামের মধ্যে স্বরূপে বিদ্যমান ছিল এবং বংশ পরম্পরায় ক্রমান্বয়ে এক জামা'আত থেকে আরেক জামা'আতে, এক স্তর থেকে আরেক স্তরে ধারাবাহিকভাবে স্থানান্তরিত হয়ে বক্ষ্যমাণ হিজরী শতাব্দী পর্যন্ত পৌঁছে, আল্লাহ তা'আলা সেগুলোর বাস্তব নমুনা ও মৌলিক শিক্ষা আকাবিরে দেওবন্দকে দান করেছেন, তারা একদিকে ঈমান-আক্বীদাগতভাবে ছিলেন দুর্নিবার ও সুদৃঢ়, কবর পূজা প্রভৃতি কুসংস্কারের বিরুদ্ধে ছিলেন আপোষহীন, সুন্নাতের অনুকরণে এতটাই যত্নবান ও সতর্ক ছিলেন যে, সামান্য থেকে সামান্য আমলও সুন্নাত পরিপন্থী হতো না, চাই তা সুন্নাতে মুআক্কাদা না হয়ে সুন্নাতে আদিয়া হোক ও তাদের সুনানে ইবাদাতের অন্তর্ভুক্ত না হোক।

**প্রথম পর্যায়ে:**
আমি আপনাদের সম্মুখে সাহাবায়ে কেরামের কিছু ঘটনা বর্ণনা করবো, সাথে সাথে আকাবিরে দেওবন্দের কিছু ঘটনাও উপস্থাপন করবো। অতঃপর আমি আহবান করবো আপনাদেরকে এই সমস্ত ঘটনার পারস্পরিক গভীর সম্পর্ক অমিল লক্ষ্য করার জন্য, আমার এই আহবান বাস্তবতার প্রকাশ হিসেবে, কবি বলেনঃ اولئك أبائ فجئنى بمثلهم-إذا جمعتنا يا جريرالمجامع. অর্থাৎঃ[স্বীয় পূর্বপুরুষের গুণাবলি বর্ণনা করার পর] তারাই আমার পিতৃপুরুষ, জনসমাগম ঘটলে সম্ভব হলে তাদের কোন সমকক্ষ নিয়ে এসো!

বাপ-দাদাদের কৃতিত্ব ও বড়ত্ব বর্ণনা করে নিজের বুক ফুলানোর মধ্যে কোনো বাহাদুরি নেই। বরং এর দ্বারা এই শিক্ষা গ্রহণই উদ্দেশ্য যে, তারা কী কী গুণাবলি দ্বারা বৈশিষ্ট্যমন্ডিত ছিলেন এবং সে তুলনায় আমাদের মাঝে কী কী ত্রুটি, দুর্বলতা, ব্যর্থতা ও অসম্পূর্ণতা রয়েছে, সেগুলো যাচাই করে তাদেরকে আয়না বানিয়ে নিজেদের জীবনের ইসলাহ্ ও সংশোধন করা।

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর সাথে সাহাবাদের মহব্বত ছিল ইশক এর স্তরের। তাদের ক্ষুদ্রতম কোনো আমলও সুন্নাত পরিপন্থী হবে এটা তাদের কাছে অসহনীয় ছিল। তাদের কারও কলিজার টুকরা সন্তানও যদি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর সুন্নাত পরিপন্থী কোনো কাজ করতো অথবা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর কোনো নির্দেশ পালনের ব্যাপারে সামান্য গড়িমসি করতো, তাহলে তার সাথে আজীবন কথাবার্তা পর্যন্ত পরিত্যাগ করতেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর এক একটি সুন্নাত তাদের নিকট এতটাই প্রিয় ছিল যে, সেটার বিপরীতে অন্য সব কিছু একেবারেই নগণ্য ও তুচ্ছ।

# হযরত ইবনে মাসউদ রাযি. যিনি প্রথম সারির বিশিষ্ট সাহাবিদের অন্যতম, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তার প্রশংসা করতে গিয়ে বলেনঃ رضيت لأمتى ما رضى لها ابن أم عبد. অর্থাৎঃ আমার উম্মতের যে ব্যাপার নিয়ে ইবনে মাসউদ সন্তুষ্ট, আমিও তাতে সন্তুষ্ট, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তৎকালীন সমগ্র সাহাবায়ে কেরামকে নির্দেশনা দিয়েছিলেন যে, اتخذوا القرأن من أربعة... অর্থাৎঃ তোমরা চারজনের নিকট থেকে কুরআন শিক্ষা করো...(মুসলিম হা. নং ২৪৬৪) তাদের মধ্যে ইবনে মাসউদ রাযি. এর নামও উল্লেখ করেছেন। তার চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য এতটা উন্নত ছিল যে, তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইহধাম ত্যাগ করেছিলেন, সেই সাহাবাগণ তখনও জীবিত যারা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর সমুন্নত জীবন চরিত স্বচক্ষে প্রত্যক্ষ করেছিলেন, দেখেছিলেন তার আমল, উঠাবসা, চাল-চলন; তাকে স্থান দিয়েছিলেন স্বীয় মনের মনি কোঠায় ও তাকে আপন করে নিয়েছিলেন, কিন্তু যাদের এই সৌভাগ্য লাভ হয়নি তাদেরও এই আকাঙ্ক্ষা ছিল যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর জীবন যাপন সম্পর্কে অবহিত হবেন, সুন্নাতকে শিখবেন, তদনুযায়ী জীবনকে সাজাবেন, যদি এর নমুনা জানা যায় তাহলে তো সৌভাগ্যের বিষয়, তাদের একজন জনৈক সাহাবীকে জিজ্ঞেস করলেন যে, আমাকে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর জীবন যাপন পদ্ধতি সম্পর্কে বলুন! তার উঠা-বসা, চলা-ফেরা, কথা-বার্তা, খাওয়া-দাওয়া ইত্যাদি কিরূপ ছিল? তিনি উত্তরে বললেনঃ আব্দুল্লাহ্ ইবনে মাসউদ রাযি.কে চিনো? সে বললোঃ জী। তিনি বললেনঃ তাহলে এক কাজ করো, কিছুক্ষণ অপেক্ষা করো, যখন ইবনে মাসউদ স্বীয় ঘর থেকে বের হবেন তখন তুমি তার অনুসরণ করে তার প্রতিটি কাজ মনোযোগ সহকারে লক্ষ্য করবে যে, তিনি চলাফেরা, উঠা-বসা, কথা-বার্তা, নামায আদায়, মসজিদে প্রবেশ এবং বের হওয়াসহ যাবতীয় কাজকর্ম কীভাবে সম্পন্ন করেন, তুমি তাকে যেভাবে করতে দেখবে, হুবহু এটিই রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর কর্মপদ্ধতি ছিলো। (বুখারী হা.নং ৩৭৬২)

দেখুন! এক সাহাবি অপর এক সাহাবির ব্যাপারে সাক্ষ্য দিচ্ছেন, এমনভাবে সুন্নাতের অনুসরণ করতেন যে, তিনি সুন্নাতের জীবন্ত নমুনা হয়ে গিয়েছিলেন।

একবার আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ রাযি. জুম'আর নামাযে উপস্থিত হলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম খুতবা দিচ্ছিলেন, কিছুলোক মসজিদে স্থান সংকুলানের অভাবে বিভিন্ন স্থানে দাঁড়িয়ে ছিলো, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাদেরকে লক্ষ্য করে বললেনঃ 'বসে পড়ো'! ইবনে মাসউদ রাযি. তখনও মসজিদে প্রবেশ করতে পারেননি, দরজার বাহির থেকে শুনলেন 'বসে পড়ো', তিনি সেখানেই বসে পড়লেন, তিনি এটা দেখতে গেলেন না যে, জায়গা পরিষ্কার কিনা, বরং তৎক্ষণাৎ বসে পড়লেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ডাক দিলেনঃ ইবনে মাসউদ! ভিতরে এসে বসো, তখন তিনি ভিতরে এসে বসলেন, প্রিয় বন্ধুগণ লক্ষ্য করুন, আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ রাযি. এর কানে আওয়াজ পৌঁছেছে 'বসে পড়ো', তো তিনি আর জিজ্ঞাসা করতে যাননি, এটা শুধু ইবনে মাসউদ রাযি. এর নয়, বরং সমস্ত সাহাবায়ে কেরাম এর সার্বিক জীবন পদ্ধতি।

# আরেকজন বিখ্যাত সাহাবি হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে উমর রাযি. এর ব্যাপারে তার পুত্র সালেম রহ.ও গোলাম নাফে' রহ. এর সূত্রে বিস্তারিতভাবে রেওয়ায়াত বর্ণিত হয়েছে যে, যখন তিনি মদিনা শরীফ থেকে মক্কা শরীফ পানে রওয়ানা করতেন, তখন তিনি পূর্ণ গুরুত্বের সাথে এবিষয়টি অনুসরণ করতেন যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কোন্ পথ দিয়ে অতিক্রম করেছিলেন, কোন্ বৃক্ষের নিচ দিয়ে যাতায়াত করেছিলেন, কোন্ ঘাটিতে অবতরণ করেছিলেন, কোন্ পাহাড়ে আরোহণ করেছিলেন, কোথায় তাঁবু গেড়েছিলেন, কোথায় সাহাবায়ে কেরামকে নিয়ে নামায পড়েছিলেন, কোথায় রাত্রি যাপন করেছিলেন, প্রভাতে কোন্ পথে বের হয়েছিলেন, কোথায় ইস্তেঞ্জার জরুরত সেরেছিলেন, এভাবে খুঁজে খুঁজে প্রতিটি আমলের পুঙ্খানো পুঙ্খোরূপে অনুকরণ করতেন। মদীনা শরীফ থেকে মক্কা শরীফ পৌঁছা পর্যন্ত, সুন্নাত অনুসরণের ক্ষেত্রে এতটাই গুরুত্ব দিতেন যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যে বৃক্ষের ছায়ায় নামায আদায় করেছিলেন, তিনিও সেই বৃক্ষের ছায়ায় নামায আদায় করেছিলেন, তা দেখে তার অনুচরগণ তাঁকে অনুরোধ করে বললেন যে, হুযুর! মসজিদ থাকতে আপনি এখানে নামায পড়ছেন? তিনি উত্তরে বললেনঃ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এখানে নামায আদায় করেছিলেন, সুতরাং আমি এখানেই নামায আদায় করবো।

একবার তিনি সফররত অবস্থায় একস্থানে বাহন থেকে অবতরণ করে একপাশে ইস্তেঞ্জা করার পদ্ধতিতে কিছুক্ষণ বসে পুনরায় সফর শুরু করলেন, সহচরবৃন্দ জিজ্ঞেস করলেনঃ হুজুর! বিষয়টি বুঝতে পারলাম না, আপনার ইস্তেঞ্জার জরুরত না থাকা সত্ত্বেও এভাবে বসার কারণ কী? তিনি বললেনঃ আরে বোকা! আমি একবার রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর এক সফরে তার সফরসঙ্গী থাকাবস্থায় তিনি এই স্থানে বাহন থামিয়ে ইস্তেঞ্জার জরুরত সেরেছিলেন, আমি কীরূপে এই স্থান অতিক্রম করে চলে যাবো?

এক্ষেত্রে শরী'আতের কোনো বাধ্য বাধকতা নেই, এগুলো রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর স্বাভাবিক কার্যক্রম ছিল যে, যেখানে নামাযের সময় হয়েছিল সেখানে নামায পড়ে নিয়েছিলেন, যেখানে রাত্র হয়েছিল সেখানে রাত্র যাপন করেছিলেন, যেখানে ইস্তেঞ্জার জরুরত হয়েছিল সেখানে সেটা সেরে নিয়েছিলেন, যে এর অনুসরণ করবে না বা এর বিরোধিতা করবে, সে সুন্নাত পরিত্যাগকারী বা বিরোধিতাকারী গণ্য হবে এমন কিছু নয়। কিন্তু ইশক ও মুহাব্বতের তাকাযা এটাই ছিলো যে, তারা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর প্রতিটি কার্যক্রমের হুবহু অনুকরণ করতেন, যত সামান্য ব্যাপারই হোক না কেন।
রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর অন্যান্য সাহাবায়ে কেরামের এ ধরনের রাসূলপ্রেমের ঘটনাবলি বর্ণনা করা শুরু হলে সময় অতিক্রান্ত হয়ে যাবে তবুও শেষ করা যাবে না। তাদের সমগ্র জীবনটাই ছিল রাসূলপ্রেমের অপূর্ব নমুনা।

এ পর্যায়ের আকাবিরে দেওবন্দের সুন্নাতের অনুসরণ ও রাসূলপ্রেমের কিছু নমুনা সংক্ষিপ্তরূপে আপনাদের সম্মুখে উপস্থাপন করছি।
আকাবিরে দেওবন্দের মধ্য থেকে যাদের নাম উল্লেখযোগ্য, তাদের অন্যতম হলেনঃ কাসেম নানুতবী রহ. ও রশীদ আহমাদ গাঙ্গুহী রহ.। কাসেম নানুতবী রহ. এর সাধারণ জীবন-যাপন, পোশাক-পরিচ্ছেদ, চাল-চলন ও সাধারণ অবস্থা দেখে কারও বোঝার উপায় ছিল না যে, ইনিই হলেন বিশ্বখ্যাত দারুল উলুম দেওবন্দের প্রতিষ্ঠাতা, হুজ্জাতুল ইসলাম মাওলানা কাসেম নানুতবী রহ.। তিনি সর্বাত্মকভাবে সুন্নাতের অনুকরণ করতেন এবং বড় বড় ত্যাগ স্বীকার করার জন্য আত্মোৎসর্গ করে দিতে পর্যন্ত সদা প্রস্তুত ছিলেন। তার পুরো জীবনে এ ধরনের অসংখ্য ঘটনা রয়েছে।

আমি তাঁর সম্পর্কে দু'টি ঘটনা বর্ণনা করছিঃ

**প্রথম ঘটনা হলোঃ**

১৮৫৭ সালে এই ভারতবর্ষকে স্বাধীন করার জন্য শামেলীর ময়দানে ইংরেজদের বিরুদ্ধে মুসলমানগণ আমীরে শরীয়ত হাজী ইমদাদুল্লাহ মুহাজিরে মক্কী রহ. এর নেতৃত্বে স্বাধীনতা যুদ্ধে ঝাঁপিয়ে পড়েছিলেন, সেখানে অগ্রণী ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়ে সম্মুখ সমরে বীর দর্পে লড়েছিলেন মাওলানা কাসেম নানুতবী রহ., রশীদ আহমাদ গাঙ্গুহী রহ., হাফেয যামেন শহীদ রহ., মাওলানা রহমতুল্লাহ্ কিরানবী রহ. সহ আরো বড় বড় উলামায়ে কেরাম। শামেলীর ময়দানে হাফেয যামেন শহীদ রহ. শাহাদাত বরণ করেন, কিন্তু ইংরেজদের চাটুকারিতায় মুসলমানদের পরাজয়ে রাজ্য সম্পূর্ণরূপে ইংরেজ বেনিয়াদের করতলগত হয়ে যায়। সম্মুখসমরে নেতৃত্বদানকারীদের নামে গ্রেফতারী পরওয়ানা জারী হয়ে যায় এবং তারা ইংরেজদের দৃষ্টিতে রাষ্ট্রদ্রোহী হওয়ার কারণে তাদের বিরুদ্ধে ফাঁসির হুকুম হয়ে যায়। জেনে শুনে নিজের প্রাণকে বিপদের মুখে ঠেলে দেওয়া ও শত্রুর হাওয়ালা করে দেওয়া যেহেতু ইসলামের শিক্ষা নয়, বরং যথাসাধ্য আত্মরক্ষার পন্থা অবলম্বন করা উচিত, তাই কাসেম নানুতবী রহ. দেওবন্দ প্রত্যাবর্তন করে তিনদিন পর্যন্ত নিজ গৃহে আত্মগোপনে ছিলেন, তিনদিন পূর্ণ হওয়ার পর ঘর থেকে বের হয়ে 'সাত্তা মসজিদে' চলে এলেন যেখানে ডালিম বৃক্ষের নিচে দারুল উলুম দেওবন্দের গোড়াপত্তন হয়, খাদেমগণ তাকে অনুনয় বিনয় করে বারবার অনুরোধ করতে লাগলেন যে, হযরত! ইংরেজরা আপনাকে পাগলা কুকুরের ন্যায় হন্য হয়ে খুঁজছে, আপনি এখনো বিপদমুক্ত নন, আপনার আরো কিছুদিন আত্মগোপনে থাকা উচিত, তখন তিনি উত্তরে যা বলেছিলেন সেটাই আমাদের জন্য লক্ষণীয় ও শিক্ষণীয়, আর তা হলোঃ তিনি বললেন যে, কাসেম এর প্রাণ তো রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ও আবু বকর রাযি. এর চেয়ে অধিক মূল্যবান নয়, কাসেম এর উপর আপতিত বিপদ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ও আবু বকর রাযি. এর উপর আপতিত বিপদের চেয়ে অধিক ভয়ানক নয়। হিজরতের পূর্ব মুহূর্তে যখন মক্কার কাফেররা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে শহীদ করে দেওয়ার চূড়ান্ত পাঁয়তারা করে ফেলেছিলো, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আবু বকর রাযি.কে নিয়ে রজনীর অন্ধকারে বের হয়ে তিনদিন পর্যন্ত ছওর গুহায় আত্মগোপনে ছিলেন, চতুর্থ দিন সেখান থেকে বের হয়ে মদীনার উদ্দেশ্যে গিয়েছিলেন, কাসেমের আত্মমর্যাদা এটা বরদাস্ত করতে পারে না যে, আমার মুনিব তিনদিন পর্যন্ত আত্মগোপনে ছিলেন, সেখানে আমি এর চেয়ে বেশী দিন আত্মগোপনে থাকবো।

চিন্তা করুন, কোথায় ছিল তাদের দৃষ্টি! প্রতি মুহূর্তে এই আশঙ্কা ছিল যে, শত্রুরা ধরে ফেলবে, যার পরিণতিতে নিশ্চিত ফাঁসি, কিন্তু দৃষ্টি ছিল সুন্নাতের উপর, আত্মগোপনেও সুন্নাতের অনুকরণ এবং বের হওয়াতেও সুন্নাতের অনুকরণ।

**অনুরূপ আরেকটি ঘটনাঃ**

তখন হিন্দুস্তানে হিন্দুদের কুসংস্কারে প্রভাবিত হয়ে মুসলমানদের মধ্যেও বিধবা-বিবাহকে দোষনীয় ভাবা হতো, ফলে বিধবাদের বিবাহ হতো না। তাই কাসেম নানুতবী রহ. যথারীতি এর বিরুদ্ধেও সোচ্চার হয়ে উঠলেন, বিধবা বিবাহের পথে জোরালো প্রচারণা চালাতে লাগলেন এবং এ বিষয়টি জনসম্মুখে বয়ান করতে লাগলেন যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর পুণ্যাত্মা পত্নীগণের মধ্যে একমাত্র হযরত আয়েশা রাযি.ই রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর সাথে কুমারী অবস্থায় বিবাহবন্ধনে আবদ্ধ হন, অন্য সকল পত্নীগণের মধ্যে কয়েকজন ছিলেন তালাকপ্রাপ্তা আর অধিকাংশই ছিলেন বিধবা, সুতরাং 'বিধবা-বিবাহ' রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ একটি সুন্নাত, এটাকে দোষনীয় মনে করা মারাত্মক অন্যায় ও ঈমানের জন্য হুমকি স্বরূপ।

এরই ধারাবাহিকতায় তিনি একবার দিল্লীর জামে মসজিদে এ বিষয়ের উপর বয়ান করছিলেন, হঠাৎ এক ব্যক্তি দাঁড়িয়ে বললোঃ হুযুর! আমার একটি কথা আছে, তিনি যেহেতু আল্লাহর ওলী ছিলেন তাই তৎক্ষণাৎ ঘটনা আঁচ করতে পেরে বললেনঃ আপনি বসুন, অতঃপর উপস্থিত জনতাকে সম্বোধন করে বললেনঃ আমাকে দশ মিনিট সময় দিন আমি একটি কাজ সেরে আসছি আপনারা বসুন, একথা বলে তিনি তার অন্দর মহলে প্রবেশ করে যেখানে তার এক বয়স্কা বিধবা বড় বোন ছিল, যার কাছে ইতিপূর্বে কোন পয়গাম আসেনি এবং তিনি প্রস্তাবও পাঠাননি, তিনি স্বীয় পাগড়ী তার পায়ের কাছে রেখে বললেনঃ আপা! আমি জানি, আপনার আর বিবাহের প্রয়োজন নেই, তবুও আপনি যদি পুনরায় বিবাহে সম্মত হয়ে যান, তাহলে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর অনেক বড় একটি সুন্নাত পুনর্জীবন লাভ করবে। তখন তার বড় বোন বললেন যে, আমার দ্বারা যদি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর মৃত প্রায় একটি সুন্নাত পুনর্জীবন লাভ করে তাহলে আমি এর জন্য সম্পূর্ণ প্রস্তুত। তিনি বের হয়ে তার এক বন্ধুর নিকট আসলেন যার স্ত্রী কিছুদিন পূর্বে মারা যায়, তাকে স্বীয় বড় বোনের সাথে তার বিবাহের প্রস্তাব দিলে সে বললো যে, এটাতো আমার জন্য সৌভাগ্যের বিষয়, আমি এতে রাজি। ঐ বন্ধু সানন্দে উক্ত প্রস্তাব লুফে নিলে তিনি ঘটনাস্থলেই দুই সাক্ষীর মাধ্যমে ঈজাব কবুল দ্বারা বিবাহ সম্পন্ন করে ফেললেন। তিনি দশ মিনিটের মধ্যেই এই পুরো কার্যক্রম সমাধা করে মসজিদে ফিরে আসলেন, অতঃপর জিজ্ঞেস করলেনঃ কে যেন কী বলতে চাচ্ছিলেন এবার বলুন, লোকটি তৎক্ষণাৎ দাঁড়িয়ে বললো যে,

ভালোই তো নিজের ঘরে বিধবা বড় বোন রেখে আমাদেরকে বিধবা বিবাহে উদ্বুদ্ধ করছেন, আগে তাকে বিবাহ দিয়ে আসুন, তিনি বললেনঃ আলহামদুলিল্লাহ! এই অসম্পূর্ণ কাজটি এইমাত্র সম্পন্ন করে এসেছি। তারপর ইশারা করলে সেই বন্ধু দাঁড়িয়ে বললোঃ আমিই তার বড় বোনকে বিবাহ করেছি, আমি তার ভগ্নীপতি।

এভাবেই আমাদের আকাবিরের প্রত্যেকে সর্বদা এ উদ্দীপনা নিয়ে থাকতেন যে, আমার প্রিয় রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর বিপন্ন প্রায় প্রতিটি সুন্নাত বাস্তবায়নের লক্ষ্যে যেই ত্যাগ তিতিক্ষাই দরকার হোক না কেন তা দেয়ার জন্য আমি সদা সর্বদা প্রস্তুত।

প্রিয় বন্ধুগণ! আমাদের আকাবির এর এ ধরনের অনেক ঘটনাই মাথায় ঘুরপাক খাচ্ছে, কোনটা ছেড়ে কোনটা বলবো ভেবে পাচ্ছি না।

এখন তাদের কিছু কিতাবের নাম উল্লেখ করছিঃ
(১) আরওয়াহে ছালাছা। (২) শাইখুল হাদীস যাকারিয়া রহ. রচিত 'আপবীতী'। (৩) শাহ্ আব্দুল কাদের রায়পুরী রহ. এর জীবনী 'সাওয়ানেহে মাওলানা আব্দুল কাদের'। (৪) মাওলানা কাসেম নানুতবী রহ. এর জীবন বৃত্তান্ত 'সাওয়ানেহে কাসেমী'। (৫) মাওলানা রশীদ আহমাদ গাঙ্গুহী রহ. এর জীবন বৃত্তান্ত 'তাযকিরাতুর রশীদ'। উর্দূ পড়া সম্ভব হলে উর্দূতে আর বাংলা অনুবাদ সহজবোধ্য হলে বাংলাতে সেই কিতাবগুলো অধ্যয়ন করা জরুরী।

এর দ্বারা আত্মশংশোধন হবে, নিজের মধ্যে আমলের আগ্রহ তৈরী হবে এবং নিজেদের নিসবতের মূল্যায়ন ও গুরুত্ব বুঝে আসবে যে, আল্লাহ তা'আলা কত মহান বুযুর্গদের নিসবত এর সাথে আমাদেরকে সম্পৃক্ত করে রেখেছেন।

**দ্বিতীয় পর্যায়ে**
আমি যে বিষয়টি নিয়ে আলোচনা করবো তা হলোঃ আমাদের আকাবির এ ব্যাপারে সদা সজাগ থাকতেন যে, খালেস দ্বীনের মধ্যে আক্বীদা ও আমলগত দিক দিয়ে বিদআত ও নব উদ্ভাবিত কোন বিষয়ের অনুপ্রবেশ কেউ যেন ঘটাতে না পারে, তাদের দৃষ্টিতে এ বিষয়টি সর্বাধিক গুরুত্ববহ ছিল।

সাহাবা যুগ থেকে তাবেঈ যুগ, তাবেঈ যুগ থেকে তাবে তাবেঈ যুগ এভাবে ক্রমান্বয়ে এক স্তর থকে আরেক স্তর হয়ে যুগ যুগ ধরে যে সম্মিলিত ও সর্বসম্মত কর্ম পদ্ধতি আজ অবধি চলে এসেছে সেটাকেই আঁকড়ে ধরতে হবে। বিশেষত সাহাবায়ে কেরাম এর সাথে মুহাব্বাত রাখা এবং তাদের ব্যাপারে সঠিক আক্বীদা পোষণ করা, তাদেরকে ভক্তি-শ্রদ্ধা করা, তাদের প্রত্যেককে যথাযোগ্য মর্যাদা দেয়া ও বিভিন্ন মুআমালা ও মাসআলাগত বিষয়ে সাহাবায়ে কেরাম এর যে অবস্থান ছিল সেটা ধরে রাখাই আমাদের আকাবিরে দেওবন্দের বিশেষ বৈশিষ্ট্য ছিল।

#আমার সম্মানিত উস্তাদ হযরত মাওলানা ফখরুদ্দীন আহমাদ মুরাদাবাদী বুখারী শরীফের দরসে বলেনঃ পৃথিবীতে যত নতুন নতুন দলের আবির্ভাব ঘটছে, প্রত্যেকেরই একই দাবি যে, আমরাই সত্যের উপর প্রতিষ্ঠিত, আমরা কিতাবুল্লাহ ও সুন্নাতে রাসূল এর অনুসরণ করি এবং সে মতে তারা নিজ নিজ মতবাদ আয়াত-হাদীস দ্বারা প্রমাণিত করার চেষ্টা করে থাকে, এহেন পরিস্থিতিতে আমাদের সম্মুখে এমন কোন মাপকাঠি থাকা উচিত, যার দ্বারা এ বিষয়টি নির্ণীত হয় যে, প্রত্যেকেই নিজ দাবির উপর কতটা সত্যবাদী।

অতঃপর আমার শাইখ বলতেন যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেন:
من يعش منكم بعدى فسيرى اختلافا كثيرا .
অর্থ: আমার মৃত্যুর পরে তোমাদের মধ্য থেকে যারা বেঁচে থাকবে, তারা অনেক মতভেদ দেখতে পাবে, যথা এই বিংশ শতাব্দীতে অনেক নতুন দল ও নতুন মতবাদের আবির্ভাব ঘটেছে, তোমাদের জন্য এ পরিস্থিতিতে আমার দিকনির্দেশনা হলোঃ
فعليكم بسنتى و سنة الخلفاء الراشدين المهديين، تمسكوا بها و عضوا عليها بالنواجذ.
অর্থাৎঃ তখন তোমরা আমার সুন্নাত ও আমার কর্মপদ্ধতি এবং হেদায়াতপ্রাপ্ত ও সঠিক পথের দিশারী খলীফাগণের কর্মপদ্ধতি অনুসরণ করো এবং তা দৃঢ়তার সাথে আঁকড়ে ধরো। (মুসনাদে আহমাদ হা.নং ১৭১৪৫)

অন্য এক হাদীসে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেন: পূর্বের উম্মত ৭২ দলে বিভক্ত হয়েছিল, আর আমার উম্মত ৭৩ দলে বিভক্ত হবে, তাদের মধ্যে একদল ব্যতীত সকলেই জাহান্নামী। সাহাবায়ে কেরাম জিজ্ঞেস করলেনঃ তারা কারা হবে? হে আল্লাহর রাসূল! তিনি বললেনঃ ما أنا عليه وأصحابى অর্থাৎঃ যে পথের উপর আমি ও আমার সাহাবাগণ রয়েছে। সুতরাং 'আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাআতই হলো একমাত্র দল যারা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ও সাহাবায়ে কেরাম এর আদর্শের উপর প্রতিষ্ঠিত ও সাহাবায়ে কেরামকে হুজ্জাত তথা প্রমাণ ও সত্যের মাপকাঠি হিসেবে জানে, তাদের সিদ্ধান্তকে শরী'আতের সিদ্ধান্ত মনে করে ও তাদের ইজমা তথা সর্বসম্মত সিদ্ধান্তকে আল্লাহর হুকুম হিসেবে মনে করে।

এই ব্যাখ্যার পর হযরত মাওলানা ফখরুদ্দীন আহমাদ মুরাদাবাদী বলেনঃ যদি কোন দলের ব্যাপারে এ সিদ্ধান্তে উপনীত হতে চাও যে, তারা হকের উপর আছে কিনা? তাহলে এটা যাচাই করো যে 'তারা সাহাবায়ে কেরামকে সত্যের মাপকাঠি মনে করে কিনা? সাহাবায়ে কেরাম এর ব্যাপারে তাদের দৃষ্টিভঙ্গি কী? তাহলে বুঝা যাবে যে তারা হক থেকে কতটুকু দূরে বা কাছে রয়েছে।

এ মাপকাঠির ভিত্তিতে আমরা দেখতে পাই যে, হিজরী প্রথম শতাব্দীতে মুতাযেলা, খাওয়ারেজ, রাওয়াফেয এর আবির্ভাব ঘটে, তাদের সকলেই সাহাবায়ে কেরাম সম্পর্কে বিরূপ ও জঘন্য আক্বীদা পোষণ করতো, তারা সাহাবায়ে কেরামকে গোমরাহ ও পথভ্রষ্ট সাব্যস্ত করেছে, আবার কোনো কোনো সাহাবীকে কাফের পর্যন্ত সাব্যস্ত করেছে। (নাঊযুবিল্লাহ্) তারা কোনো সাহাবীকে মর্যাদা দিতে গিয়ে অতিরঞ্জিত করেছে, আবার কোনো সাহাবীকে দোষারোপ করে বাস্তব মর্যাদা থেকে অনেক নিচু স্তরে নামিয়ে দিয়েছে। এই শেষ যমানায়ও নতুন কিছু দলের আবির্ভাব ঘটেছে, আমি সুনির্দিষ্টভাবে দু'টি দলের কথা বলবো।

# একটি দল হল 'জামায়াতে ইসলামী', আমাদের আকাবির এর সাথে তাদের কোন ধরনের সম্পর্ক ছিল না, যদিও আমাদের একদল বিজ্ঞ আলেম, গ্রন্থ প্রণেতা ও ইসলাহী মুরব্বী মওদুদীর সাথে একাত্মতা ঘোষণা করেছিলেন, আল্লাহ তা'আলা হযরত হুসাইন আহমাদ মাদানী রহ.কে উত্তম প্রতিদান দান করুন, তিনি সূক্ষ্ম দৃষ্টি ও ঈমানী দূরদর্শিতার দ্বারা আচঁ করতে পারলেন যে, তারা সুন্দর লিখনি ও পোশাক-পরিচ্ছেদের অন্তরালে ঘাপটি মেরে ছিল। তাদের প্রথম প্রকাশনার মধ্যে লিখিত ছিল: 'আল্লাহ ও তাঁর রাসূল ব্যতীত কাউকেও সমালোচনার উর্ধ্বে মনে করা যাবে না, বরং প্রত্যেককেই আল্লাহ প্রদত্ত মাপকাঠির উপর রাখতে হবে। কথা তো খুব সুন্দর। কিন্তু হযরত হুসাইন আহমাদ মাদানী রহ. প্রশ্ন উত্থাপন করে বসলেন যে, তাহলে সাহাবায়ে কেরাম সম্পর্কে কী বলেন?, তারাও কি সাধারণ উম্মতের ন্যায়, তাদেরও কি কাজকর্মের সমালোচনা করা যাবে যেমনি ভাবে সাধারণ মানুষের বেলায় করা যায়? তারা উত্তরে বললোঃ হ্যাঁ। এ কারণেই দেখা যায় যে, তারা প্রথম সারির সাহাবায়ে কেরাম যথা উমর রাযি. উসমান রাযি. আমর বিন আস রাযি. আয়েশা রাযি. মুআবিয়া রাযি. প্রমুখ বিখ্যাত সাহাবিকে নির্মমভাবে সমালোচনার পাত্র বানিয়েছিলো, তাদের কাছে এ বিষয়ে জবাবদিহিতা করা হলে তারা বললো যে, মানুষের অন্তরে উপরোক্ত সাহাবাদের সম্মানের ভূত এমনভাবে চেপে বসেছে যে, যতক্ষণ না তাদেরকে সমালোচনার তীরে বিদ্ধ করে ক্ষত বিক্ষত করা হবে, ততক্ষণ পর্যন্ত মানুষের অন্তর থেকে সেই ভূত অপসারণ করা সম্ভব হবে না। (নাঊযুবিল্লাহ)

# আরেকটি দল হলোঃ 'আহলুল হাদীস', অর্থাৎ যারা শরীয়ত স্বীকৃত চারটি মূলনীতি থেকে দু'টি মূলনীতি ইজমা ও কিয়াসকে বর্জন করে আর বাকী দু'টি মূলনীতি কুরআন ও হাদীসের অনুসরণের দাবী করে। অথচ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর ভাষ্য " ما أنا عليه وأصحابى অর্থাৎঃ আমি ও আমার সাহাবাগণ যে পথে রয়েছেন তা তোমরা আঁকড়ে ধরো।" এর আলোকে উল্লেখিত চারটি বিষয়ই শরী'আতের মূলনীতি হিসেবে সু-প্রমাণিত। এরাই আবার এমন সব মাসআলাতে দ্বিমত পোষণ করে সমগ্র মুসলিম উম্মাহ্ থেকে ভিন্ন পথ অবলম্বন করেছে, যার সবক'টিই সাহাবায়ে কেরাম পর্যন্ত বিশুদ্ধ ও নিরবচ্ছিন্ন বর্ণনা দ্বারা প্রমাণিত।

**উদাহরণ স্বরূপ:**
# তারাবীহ এর নামায বিশ রাকা'আত হওয়ার সিদ্ধান্ত হযরত উমর রাযি. এর যুগের সমস্ত সাহাবায়ে কেরাম এর সম্মতি ও ঐক্যমতে গৃহীত হয়।
# জুম'আর নামাযের প্রথম আযান এর সিদ্ধান্ত হযরত উসমান রাযি. এর যুগের সকল সাহাবার ঐক্যমতে হয়।
# এক মজলিসে তিন তালাক দেওয়ার দ্বারা তিন তালাকই সংঘটিত হওয়ার ব্যাপারে হযরত উমর রাযি. এর যুগের সকল সাহাবায়ে কেরাম এর ঐক্যমত প্রতিষ্ঠিত হয়।

এ সব মাসআলা সমস্ত সাহাবায়ে কেরাম এর সম্মিলিত সিদ্ধান্তের ভিত্তিতে কার্যকর হয়ে ক্রমাগতভাবে আমাদের নিকট পৌঁছেছে, এতে কারো কোনো দ্বিমত ছিল না, কারণ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেছেন: تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ. অর্থাৎঃ সাহাবায়ে কেরাম এর কর্মপদ্ধতিকে দৃঢ়তার সাথে আঁকড়ে ধরো। আমরা তো রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর কথার অনুসরণ করছি, আমাদের তো এই স্পর্ধা ও দুঃসাহস নেই যে, হযরত উমর রাযি. কর্তৃক সর্বসম্মতভাবে গৃহীত কোনো সিদ্ধান্তকে 'বিদআতে উমরী' বলবো, অথবা উসমান রাযি. কর্তৃক সম্মিলিত কোনো সিদ্ধান্তকে 'বিদআতে উসমানী' বলবো। এটাই হলো আমাদের আকাবির এর আদর্শ।

সুতরাং আহলে সুন্নাত ওয়াল জামা'আতের স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্য হিসেবে আমাদের করণীয় হলোঃ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সাহাবায়ে কেরামকে যে মর্যাদায় অধিষ্ঠিত করে গিয়েছেন তাদের সেই মর্যাদা অক্ষুণ্ণ রাখতে সচেষ্ট থাকা ও তাদেরকে সেই স্তরেই সমাসীন রাখা, তাদের সিদ্ধান্ত, বর্ণনা ও সর্বসম্মত ঐক্যকে তদ্রুপভাবেই প্রমাণরূপে গ্রহণ করা, যেরূপে কুরআন ও সুন্নাহকে বাস্তব নির্দেশ ও মূলনীতি সাব্যস্ত করা হয়। এভাবেই আমাদের আকাবির সুন্নাতের অনুকরণের সর্বোচ্চ গুরুত্বারোপ করে থাকতেন।

# তদ্রুপভাবে তাযকিয়াহ ও আত্মশুদ্ধির প্রয়োজনীয়তা অস্বীকার করা ও এটাকে বিদআত বলা মারাত্মক গোমরাহী। বস্তুত এটি হলো ইসলামের নির্দেশ, হাদীসে জিবরাঈলের সুস্পষ্ট ভাষ্য: জিবরাইল আ. রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর দরবারে মানুষের আকৃতিতে এসে জিজ্ঞেস করলেনঃ أخبرنى عن الإيمان আমাকে ঈমান সম্পর্কে বলুন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বর্ণনা করলেন, অতঃপর জিজ্ঞেস করলেনঃ أخبرنى عن الإحسان আমাকে ইহসান সম্পর্কে বলুন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেনঃ ان تعبدالله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. অর্থ: এমনভাবে আল্লাহ তা'আলার ইবাদত করবে যেন তুমি তাঁকে দেখছো, আর যদি তুমি তাঁকে দেখছো এটা ভাবতে না পারো, তাহলে মনে রাখবে যে, অবশ্যই তিনি তোমাকে দেখছেন। উম্মতকে শিক্ষা দেওয়ার জন্য 'ঈমান' ও 'ইসলাম' এর পর

স্বতন্ত্রভাবে ‘ইহসান’ সম্পর্কেও প্রশ্নোত্তর করেছেন, এর দ্বারা প্রতীয়মান হয় যে, ‘ইহসান’ একটি স্বতন্ত্র গুরুত্বপূর্ণ বিষয়, আল্লাহ তা‘আলা ইরশাদ করেন:فأحسنوا،إن الله يحب المحسنين. অর্থ: তোমরা ‘ইহসান’ করো, নিশ্চয় আল্লাহ তা‘আলা ‘ইহসানকারীদের’কে পছন্দ করেন।

প্রিয় ভাই ও বন্ধুগণ! এই ইহসানই হলো তাসাওউফ ও সুলূক তথা আত্মশুদ্ধি ও আধ্যাত্মবাদ, এটাই শিক্ষা দেওয়া হয়েছে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর হাদীস إنما الأعمال بالنيات. (অর্থ: যাবতীয় আমলের প্রতিদান নিয়তের উপরই নির্ভরশীল) এর মাধ্যমে, এটাই শিক্ষা দেওয়া হয়েছে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর বাণী أن تعبدالله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. (অর্থ: এমনভাবে আল্লাহ তা‘আলার ইবাদত করবে যেন তুমি তাঁকে দেখছো, আর যদি তুমি তাঁকে দেখছো এটা ভাবতে না পারো তাহলে মনে রাখবে যে, অবশ্যই তিনি তোমাকে দেখছেন।) এর মাধ্যমে, চরিত্র সংশোধনের জন্য এটারই নির্দেশ দেওয়া হয়েছে, এ লক্ষ্যেই রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এ ধরাধামে আগমন করেছিলেন, আল্লাহ তা‘আলা ইরশাদ করেন هو الذى بعث فى الأميين رسولا منهم يتلو عليهم أياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة. অর্থ: তিনিই সেই সত্তা যিনি নিরক্ষরদের মাঝে রাসূল প্রেরণ করেছেন তাদের মধ্য থেকেই, যে তাদের কাছে আয়াত পাঠ করবে এবং তাদেরকে কুরআন ও প্রজ্ঞা শিক্ষা দিবে এবং তাদের আত্মার সংশোধন করবে, এখানে আল্লাহ তা‘আলা কিতাব ও হিকমত শিক্ষা দানের মাধ্যমে আত্মার সংশোধনের কথা বলেছেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেন: সে ব্যক্তি বেহেশতে প্রবেশ করতে পারবে না যার অন্তরে বিন্দু পরিমাণ অহংকার রয়েছে। তিনি আরও ইরশাদ করেন: ক্ষুধার্ত নেকড়ে বাঘকে বকরীর পালে ছেড়ে দিলে ততটা ক্ষতিসাধন হয় না, অর্থ ও পদের লালসা দ্বারা ইসলামের যতটা ক্ষতিসাধন হয়।

যদি পন্থা বলে দেওয়াটাই আত্মশুদ্ধির জন্য যথেষ্ট হত, তাহলে সেটা ‘ويعلمهم الكتاب والحكمة অর্থাৎ; তাদেরকে কুরআন ও প্রজ্ঞা শিক্ষা দিবে’ এর মধ্যেই এসে গেছে, তো ভিন্নভাবে ‘ويزكيهم অর্থাৎঃ এবং তাদের আত্মার সংশোধন করবে’ এটা সংযোজন করার কীইবা প্রয়োজন ছিলো? এর দ্বারা প্রতীয়মান হয় যে, ‘তাযকিয়াহ’ তথা আত্মশুদ্ধির আমল রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম করেছেন, সাহাবায়ে কেরাম, তাবিঈন, তাবে তাবিঈন সকলেই করেছেন, এবং ক্রমাগতভাবে এটি দ্বীনের গুরুত্বপূর্ণ অংশ হিসেবে উম্মতের প্রতিটি স্তরে বিদ্যমান ছিল, এরই ধারাবাহিকতায় বিদআত ও বানোয়াট মুক্ত এই বিশুদ্ধ তাসাওউফ ও আত্মশুদ্ধি আমাদের আকাবির এর কর্মপন্থারই অংশ হিসেবে ছিল। হাজী ইমদাদুল্লাহ মুহাজিরে মক্কী রহ. ছিলেন এই আধ্যাত্মিক জগতে আমাদের সকলের শিরোমণি, আর কাসেম নানুতবী রহ., রশীদ আহমাদ গঙ্গুহী রহ., আশরাফ আলী থানবী রহ. ছিলেন সরাসরি তার অনুমতিপ্রাপ্ত খলীফা ও শিষ্য। থানবী মাদানী সাহারানপুরী সহ হেদায়াতের যাবতীয় সিলসিলা তার সাথে গিয়েই একীভূত হয়েছে।

বিশুদ্ধ তাওহীদ, রাসূলপ্রেম, সুন্নাতের অনুকরণ, সাহাবায়ে কেরাম এর সম্মান ও তাদের প্রতি সঠিক আক্বীদা পোষণ করা আকাবিরে দেওবন্দের আদর্শ, আর সমগ্র দ্বীনী ও কওমী মাদরাসাসমূহ এবং তৎসংশ্লিষ্ট বড় বড় মাশায়েখবৃন্দ যারা বাংলাদেশসহ বিশ্বের আনাচে কানাচে ছড়িয়ে ছিটিয়ে আছেন, তারা সকলেই উক্ত আদর্শের ধারক-বাহক, তারা একদিকে হাদীসের মসনদে শাইখুল হাদীসের আসনে অধিষ্ঠিত, অন্যদিকে খানকার মধ্যে মুরশিদ ও পথ প্রদর্শক এর ভূমিকায় অবতীর্ণ, একদিকে অসংখ্য ইলম পিপাসু তাদের থেকে উপকৃত হচ্ছেন, অপরদিকে সাধারণ মানুষ বাতিলের সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করে তাদের ছায়াতলে আশ্রয় গ্রহণ করে ধন্য হচ্ছেন।

সুতরাং প্রিয় ভাইগণ! এই নিসবতকে মূল্যায়ন করুন, এর গুরুত্ব অনুধাবন করুন, এই দ্বীনী শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোকে রক্ষণাবেক্ষণের জন্য সর্বাত্মকভাবে সচেষ্ট থাকুন, সর্বদা এর সহযোগিতা করুন, উলামায়ে কেরামের দরবারে বেশি বেশি উপস্থিত হোন, তাদের সাথে সুসম্পর্ক রাখুন, তাদের কথাবার্তা ও যাবতীয় দিক নির্দেশনা মেনে চলার জন্য সদা সচেষ্ট থাকুন, তাহলে আশা করা যায় এই ফেৎনা-ফাসাদের যুগেও এটাই হবে আমাদের হেদায়াতের পথ, এটাই হবে আমাদের মুক্তির পথ, ইনশাআল্লাহ্।

আপনাদের নিকট সংক্ষিপ্ত এই কথাগুলো পেশ করে এখানেই শেষ করছি।

আল্লাহ তা‘আলা আমাদেরকে আমল করার তাওফীক দান করুন। আমীন।

وأخر دعوانا ان الحمد لله رب العلمين